সংবাদ

তারিখ : 11 JUL 2005
পৃষ্ঠা ... ... ৬ ... ... ৭ ...

শিক্ষক নামের কলঙ্ক

শিক্ষকের নির্মম বেত্রাঘাতে প্রাণ হারাতে হয়েছে ১০ বছরের শিশু দীপুকে। এ ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্থলে নয়াটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শিশুটিকে অমানুষিকভাবে নির্যাতনের সঙ্গে দু'জন শিক্ষক জড়িত বলে জানা গেছে। তার মধ্যে মুখ্য ভূমিকা নাকি ছিল প্রধান শিক্ষিকা শাহীনা আখতারের। ক্লাস শিক্ষক খোরশেদুল হকের প্ররোচনায় তিনি একসঙ্গে দুটি বেত দিয়ে কোমলপ্রাণ শিশুটিকে অমানুষিকভাবে প্রহার করেন। শিশুটি শিক্ষিকার পায়ে লুটিয়ে পড়েও নিজেকে বাঁচাতে পারেনি তার বর্বরতা থেকে। একপর্যায়ে শিশুটি নেতিয়ে পড়ে মাটিতে। তাতেও নাকি প্রধান শিক্ষিকার আক্রোশ থামেনি। প্রধান শিক্ষিকার শিশু নির্যাতনের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এর আগেও তার হাতে একইভাবে নির্যাতিত হয়েছে চাঁদনী নামে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রী। চাঁদনীর মা রীনা বেগম জানিয়েছেন, প্রধান শিক্ষিকার বদমেজাজের কারণে তিনি তার মেয়েকে অন্য স্কুলে ভর্তি করাতে বাধ্য হয়েছেন। শিশুদের প্রতি যার বিন্দুমাত্র মমত্ববোধ নেই এমন ব্যক্তি কীভাবে স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান তা আমাদের বোধগম্য নয়। এখানে সঙ্গত কারণেই আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অভিযোগ আছে যে, সরকারি স্কুলগুলোয় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা নয়, দলীয় পরিচয় এবং প্রদত্ত ঘুষের অঙ্কই হচ্ছে নিয়োগপ্রাপ্তির প্রধান মাপকাঠি। এ অভিযোগ যে মোটেও অসত্য নয় তা সবাই জানে। দীপুর দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর জন্য এই অস্বচ্ছ ও দুর্নীতিগ্রস্ত নিয়োগ প্রক্রিয়াও সমভাবে দায়ী বলে আমরা মনে করি। অতএব, এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে হলে মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিরা যাতে নিয়োগ পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রধান শিক্ষক মূলত ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন। অন্য শিক্ষকরা বাড়াবাড়ি করলে ছাত্র ও অভিভাবকরা সবসময় প্রধান শিক্ষকের শরণাপন্ন হন প্রতিকারের আশায়। অন্য শিক্ষকদের তুলনায় বাবা-মা'রাও প্রধান শিক্ষকের ওপর ভরসা করেন বেশি। বাবা-মা'রা যার ওপর ভরসা করে নিজেদের সন্তানকে স্কুলে পাঠান, সেই প্রধান শিক্ষকের যে রূপটি আমাদের দেখতে হলো তার সঙ্গে আর দশজন সন্ত্রাসীর আদৌ কোন তফাৎ আছে কি? এটা কি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নাকি আমাদের সমাজে আজ মূল্যবোধের যে সর্বব্যাপী অবক্ষয় চলছে তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ? আজকের সভ্য সমাজে খুব কম বাবা-মা'ই আছেন যারা সন্তানের গায়ে হাত তোলেন বা হাত তোলাটা অনুমোদন করেন। বিশ্বব্যাপী বহুদিন থেকে শিশুদের ওপর সব ধরনের নির্যাতনকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়ে আসছে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার বিষয়ক সনদে এটাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইউনিসেফের এ সংক্রান্ত বেশ জনপ্রিয় কিছু প্রচারণাও রয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, এসবের কোনকিছুই যাকে স্পর্শ করেনি তিনি একটি সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হলেন কোন যোগ্যতাবলে?

দু'দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে শিশুটি মারা গেছে। তার আগে মুমূর্ষু শিশুটিকে নিয়ে তার হতভাগ্য পিতাকে ঘুরতে হয়েছে হাসপাতালের দুয়ারে দুয়ারে। পিজি, ঢাকা মেডিকেল ও শিশু হাসপাতাল– সবাই নানা অজুহাতে শিশুটিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। জনগণের অর্থে পরিচালিত হাসপাতালগুলোকে একটি মুমূর্ষু শিশুকে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কে দিয়েছে? দরিদ্র বলেই কি তাদের সঙ্গে এ আচরণ করা হয়েছে? এ আচরণ কি সরকার বা বিরোধীদলের কোন নেতাকর্মী বা কোন প্রভাবশালীর সঙ্গে তারা করতেন বা করার সাহস পেতেন? আমরা মনে করি, কেন সরকারি হাসপাতালে তাদের ভর্তি করা হলো না, তার যথাযথ তদন্ত হওয়া দরকার। জনগণের জানার অধিকার আছে তাদের অর্থে পরিচালিত হাসপাতালে সবাই সমান আচরণ পাচ্ছে কি পাচ্ছে না।

পুলিশ ইতোমধ্যে অভিযুক্ত দুই শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে। কবর থেকে লাশ তোলা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, পিটিয়ে হত্যার ঘটনা জানা সত্ত্বেও পুলিশ ময়নাতদন্ত ছাড়া লাশ দাফন করতে দিল কেন? জনমনে তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, স্বাভাবিকভাবে এদেশের সরকার বা পুলিশ কি কোন ভূমিকাই রাখবে না?

এটা সর্বজনবিদিত যে, এদেশে নানাভাবে প্রতিদিন শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। ঘটছে শিশু পাচারের মতো জঘন্য ঘটনাও। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও যে এক্ষেত্রে খুব পিছিয়ে নেই তার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছে দীপুর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা। এর আগে মাদ্রাসায় দিনের পর দিন শিশুদের পায়ে শিকল পরিয়ে রাখার সচিত্র প্রতিবেদনও ছাপা হয়েছে পত্রপত্রিকায়। পিটিয়ে ছাত্র হত্যার ঘটনা আগেও ঘটেছে। আমরা মনে করি, সমাজের সব পর্যায়ে সব ধরনের শিশু নির্যাতন স্থায়ীভাবে বন্ধ করা প্রয়োজন। এজন্য বিদ্যমান আইনে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব না হলে প্রয়োজনে কঠোর শাস্তির বিধানসহ নতুন আইন করতে হবে।